মু'আওবিযাতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম "মু'আওবিযাতাইন" (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়েলে নবুওয়াত" বইতে লিখেছেন ঃ এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে "মু'আওবিযাতাইন"। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ ، لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

"তোমরা কি কোন খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়েতগুলো এ

বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বায়হাকী, হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী, আবদ ইবনে হুমায়েদ এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ইহুদিরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছেল। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিল, তারপর কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমের। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীমের (সা) বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হুকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাসসির এ সূরা দু'টিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষপটে এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরূনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন—যাদের বন্দেগী তোমরা করছো

আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু-টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জন-মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় ঃ "আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।" (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ-

"আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না" (আল মু'মিন, ২৭)

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ

"আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।" (আদ দুখান, ২০)।

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিপুল উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শক্তিশালী দুশমনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্যের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের মোকাবেলা করার মতো কোন বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা "তোমাদের মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি" এই বলে দুশমনদের হুমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কূট কৌশল ও শত্রুতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে ঃ সত্যের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তার কোন পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিষ্কার করে দিতে চাই । এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নু'আইম, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির এবং (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমুক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো বড় সাহাবী যখন এই মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দু'টি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন–পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাকেল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোন কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোন সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষারোপ হচ্ছে তার জবাব কি ? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হাফেয বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই ঃ সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি লিখিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রা) একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মোকাবেলায় কোন মূল্যই রাখে না।

চার ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন,

অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সূরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বরাত দিয়ে আমরা হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন ঃ আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিব্বানও এই হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন ঃ "যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সূরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।" সাঈদ ইবনে মনসূর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) ফজরের নামাযে এ সূরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (সা) তাঁকে বলেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সূরা পড়তে থাকবে। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ "লোকেরা যে সূরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শেখাবো না? তিনি আরজ করেন, অবশ্যি শিখাবেন। হে আল্লার রসূল! একথায় তিনি তাকে এ আল ফালাক ও আন নাস সূরা দু'টি পড়ান। তারপর নামায দাঁড়িয়ে যায় এবং নবী করীম (সা) এ সূরা দু'টি তাতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ "হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি?" এরপর তাকে হিদায়াত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সূরা দু'টি পড়ো। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর "মুআওবিযাত" (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করিম (সা) সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত রেখে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সূরা হূদ সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দেবেন? বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক'-এর চাইতে বেশী বেশী উপকারী আর কোন জিনিস নেই।" নাসাঈ, বায়হাকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আব্দুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আশ্রয় প্রার্থীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনগুলো?" আমি বললাম, অবশ্যি বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন ঃ "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" সূরা দু'টি।" ইবনে মারদুইয়া হযরত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যে সূরাগুলো সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন তা হচ্ছে", কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ ধরনের ভুল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আমরা এর জবাব পেতে পারি।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হুকুম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে যির ইবনে জুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উবাইকে (রা) বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, 'কুল' (বলো), কাজেই আমিও বলেছি 'কুল।' তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন।" ইমাম আহমাদের বর্ণনা মতে হযরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিব্রীল (আ) 'কুল আউজু বিরব্বিন নাস' বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল (সা) যেভাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।" এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উভয় সূরায় 'কুল' (বলো) শব্দ দেখে এ ভুল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আউযু বিরব্বিল ফালাক (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) ও "আউযু বিরব্বিন নাস" (আমি সমস্ত মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করিমকে (সা)-এর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূলের (সা) সামেনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ জিব্রীল আলাইহিস সালাম যেহেতু 'কুল' বলেছিলেন তাই আমিও 'কুল' বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হুকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।" বরং সে ক্ষেত্রে 'বলো' শব্দটি বাদ দিয়ে "আমি আশ্রয় চাচ্ছি' বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি" এবং এ পয়গাম তার নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি লোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো, হুবহু পৌঁছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোন একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা 'কুল' শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি অহীর কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক

সেভাবেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হুকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অহীর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করিম (সা)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল হুবহু সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সংযোজিত করতেন না। বরং এ হুকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিন্তা–ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামকে ভুল–ক্রটি মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোন কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাথেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অর্থহীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোন ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই–বাছাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদে মুখর হবে সে হবে একজন মস্তবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অস্বীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী করীমের (সা) ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কতটা যাদুর প্রভাবে ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে

ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংঘর্ষশীল। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে ঃ

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا-

"জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।" (বনি ইসরাঈল, ৪৭) আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উথাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হুবহু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৃহীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সম্ভাবনার কোন পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোন একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অমুক অমুক ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে এ অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে,

এর এক একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'–এর পর্যায়ভুক্ত হলেও মূল বিষয়বস্তুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং একসাথে গ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরছি।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনি যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।[1] তারা তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চাইতে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মাদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহর (সা) চিরুনীর একটি টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরুনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে— তার বোনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণের[2] নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী–আযওয়ান নামক কূয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেলো। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোন কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোন কোন সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোন জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও

১. কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তরভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোন গোত্র ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল খাযরাজদের অন্তরভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।

২. শুরুতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পুরুষ খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রংয়ের মতো। তার গন্ধ হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোন একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কোন আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোন পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। অথবা এমন কোন কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর ওপর নাযিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোন নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে তিনি মনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথচ আসলে তা পড়েননি। নাউযুবিল্লাহ, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে নবীকে কেউ কাৎ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমুন্নত থেকেছে। তার ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হযরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আশেয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, "দু'জন লোক (অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা দু'জন লোকের আকৃতি ধরে) আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এঁর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে আবৃত চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কূয়া যী–আযওয়ানের (অথবা যী–যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এ জন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কূয়ার পানি সেঁচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে ইয়াসির (রা) ও হযরত যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হযরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আযযুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আযযুরাকী (অর্থাৎ বনি যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী (সা) নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কূয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তার মধ্যে চিরুনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তার গায়ে কয়েকটি সুঁই ফুটানো ছিল। জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুঁইও তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুঁই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যেমন কোন ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তারপর তার বাঁধন খুলে গেলো। তারপর তিনি লাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তার দোষ স্বীকার করলো এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য তিনি কোনদিন কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি।

শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথাবার্তা বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিচ্ছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সাথে যে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও তার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসা (আ)–এর মোকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মোকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো (سَحَرُوٓا اَعْيُنَ النَّاسِ) । সূরা ত্বা–হায় বলা হয়েছে ঃ তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই মর্মে অহী নাযিল করলেন যে, ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুঁড়ে ফেলো।

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى
فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى - قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى
وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ – طٰهٰ : ٦٦-٦٩

এখানে যদি আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের গল্প শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয় ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তার ওপর পড়েছিল, তাঁর নবীসত্তা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোন বিষয়ের সাথে এ আপত্তি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কাল্পনিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে

ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভয় একটি মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বুঝি প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন হয়েছে। হযরত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হযরত মূসার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ বেবিলনে হারুত ও মারুতের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের গুলী ও বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিচ্ছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়–ফুঁকের কোন অবকাশ আছে? তাছাড়া জাড়–ফুঁক যথার্থই কোন প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল ফালাক ও আন নাস এবং কোন কোন হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিন বার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে—সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষ বারে রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হযরত আয়েশা (রা) এ সূরাগুলো (স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা নবী করীমের হুকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত রেওয়ায়াত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর রসূলের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)–এর চাইতে আর কারো বেশী জানার কথা নয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীটি ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না জাড়–ফুঁক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। (মুসলিম) হযরত মুগীরা ইবনে শোবার (রা) বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়–ফুঁক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থেকে িঃসম্পর্ক হয়ে গেলো। (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়–ফুঁক করা, তবে সূরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সূরা ইখলাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। কোন কোন হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম (সা) ঝাড় ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিছেলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ এতে কোন শিরকের আমেজ থাকতে পারবে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়–ফুঁক করতে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোন গুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সঙ্গে ভরসা জাড়–ফুঁকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়–ফুঁকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীমকে (সা) বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবন আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছিল সেখানে নোনতা পানি দিয়ে ডলতে থাকেন আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস পড়তে থাকেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন ঃ

اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة –

"আমি তোমাদের দু'জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

(বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা

হয়েছে ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী (সা) বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনেসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি ভীত।" মুআত্তায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিব্রীল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?" জবাব দেন হাঁ জিব্রীল বলেন,

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ -

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও হিংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে গেলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিব্রীল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হাদীসে উদ্ধৃত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা (রা) বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

* ভদ্র মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হযরত উমরও (রা) এ বংশের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হযরত হাফসার (রা) আত্মীয়া।

তিনি পিঁপড়া বা মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়–ফুঁক করতেন। রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ হাফসাকেও এ আমল শিখিয়ে দাও। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছো তেমনিভাবে এ ঝাড়–ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়–ফুঁক করতাম। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়–ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়–ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল ছিল যার সাহায্যে আমরা বিছু (বা সাপ) কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাঁকে শুনালো। তিনি বললেন, "এর মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যি তা করা উচিত।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ হাযম পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা প্রক্রিয়া জানতো। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিও একথা সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়–ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিমেও হযরত আনাস (রা) থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বিষাক্ত প্রাণীদের কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও নজর লাগার জন্য ঝাড়–ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম হযরত উমাইর মাওলা আবীল লাহাম (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি আমল জানতাম। তার সাহায্যে আমি ঝাড়–ফুঁক করতাম। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, উমুক উমুক জিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি ঝাড়তে পারো।

মুআত্তায় বলা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা)–এর ঘরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে ঝাড়–ফুঁক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়ো। এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইঞ্জিলের আয়াত পড়ে ঝাড়–ফুঁক করে তাহলে তা জায়েয।

এখন ঝাড়–ফুঁক উপকারী কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল (সা) নিজেও লোকদেরকে কোন কোন রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত 'কিতাবুত তিব" (চিকিৎসা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিৎসা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রুগীও মরতো না। এখন চিকিৎসা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হুসনা (ভালো ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র বস্তুবাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী মনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়–ফুঁকের ওপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল লোককে মাদুলি তাবীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু'পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারীতে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রসূলে করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তারা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোন ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত

* বস্তুবাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপারে দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ষোল ঘন্টা পর্যন্ত পেশাব আটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি জালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমিই আমার চিকিৎসা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তাকে বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু'পায়ের গোছায় দাদে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোন রকম চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছিলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোন প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধ ছাড়াই সমস্ত দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

আবু সাঈদ বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছো, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোন কোন বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হযরত আবু সাঈদ সরদারের কাছে যান। তার ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশেষে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা তাতো জানা নেই। কাজেই তাঁরা নবী করীমের (সা) কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রমাণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এ কাজ করেছিলেন। রসূলে করীমও (সা) একে শুধু জায়েযই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ রাখার হুকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয ও নাজায়েয হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল চলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে কোন হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌঁছে যে খাবার-দাবার কিনে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পরে বিনিময়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজী হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর ওপর ভরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাঁদের সামনে হাযির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন।

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) যে এ আমলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এমন কি হযরত আবু সাঈদ নিজে এ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে এ দু'টি কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) যে রেওয়ায়াত আছে তাতে রসূলে করীমের (সা) বক্তব্যে বলা হয়েছে ان احق ما اخذتم عليه اجـرا كتب الله তোমরা অন্য কোন আমল না করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এভাবে আরবের সংশ্লিষ্ট গোত্রটির ওপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে। যারা শহরে ও গ্রামে বসে ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুযুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর আয়াত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্তি হয় আল ফালাক ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাব্বুল আলামীন, রহমান রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে বান্দা নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দেগী করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানব জাতির রব, মানব জাতির বাদশাহ ও মানব জাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানব জাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই সূরার যে সম্পর্ক তা কোন গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

বলো,[১] আশ্রয় চাচ্ছি[২] আমি প্রভাতের রবের,[৩] এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।[৪] এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[৫] আর গিরায় ফুঁৎকারদানকারীদের (বা কারিনীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।[৬] এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৭]

১. রিসালাতের প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে পয়গাম নাযিল হয় قُلْ (বলো) শব্দটি যেহেতু তার একটি অংশ, তাই একথাটি প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হলেও তার পরে প্রত্যেক মু'মিনও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়।

২. আশ্রয় চাওয়া কাজটির তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এক, আশ্রয় চাওয়া। দুই, যে আশ্রয় চায়। তিন, যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আশ্রয় চাওয়ার অর্থ, কোন জিনিসের ব্যাপারে ভয়ের অনুভূতি জাগার কারণে নিজেকে তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কারো হেফাজতে চলে যাওয়া, তার অন্তরাল গ্রহণ করা, তাকে জড়িয়ে ধরা বা তার ছায়ায় চলে যাওয়া। আশ্রয়প্রার্থী অবশ্যি এমন এক ব্যক্তি হয়, যে অনুভব করে যে, সে যে জিনিসের ভয়ে ভীত তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার নেই। বরং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর যার আশ্রয় চাওয়া হয় সে অবশ্যি এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা সত্তা হয় যার ব্যাপারে আশ্রয় গ্রহণকারী মনে করে সেই ভয়ংকর জিনিস থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে। এখন এক প্রকার আশ্রয়ের প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কার্যকারণের জগতে কোন অনুভূত জড় পদার্থ, ব্যক্তি বা শক্তির কাছে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গের আশ্রয় নেয়া, গোলাগুলীর বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পরিখা, বালি ভর্তি থলের প্রাচীর বা

ইটের দেয়ালের আড়াল নেয়া, কোন শক্তিশালী জালেমের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোন গাছ বা দালানের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রয় হচ্ছে, প্রত্যেক ধরনের বিপদ, প্রত্যেক ধরনের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে কোন অতি প্রাকৃতিক সত্তার আশ্রয় এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অননুভূত পদ্ধতিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবশ্যি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শুধু এখানেই নয়, কুরআন ও হাদীসের যেখানেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কথা এসেছে, সেখানেই এ বিশেষ ধরনের আশ্রয় চাওয়ার অর্থেই তা বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা না করাটাই তাওহীদী বিশ্বাসের অপরিহার্য অংগ। মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সত্তা যেমন জিন, দেবী ও দেবতাদের কাছে এ ধরনের আশ্রয় চাইতো এবং আজো চায়। বস্তুবাদীরা এ জন্য বস্তুগত উপায়–উপকরণের দিকে মুখ ফিরায়। কারণ, তারা কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মু'মিন যেসব আপদ–বিপদ ও বালা–মুসিবতের মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে। উদাহরণ স্বরূপ মুশরিকদের ব্যাপরে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ـ

"আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানব জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোক জিন জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬) এর ব্যাখ্যায় আমরা সূরা জিনের ৭ টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। তাতে বলা হয়েছে ঃ আরব মুশরিকদের যখন কোন রাতে কোন জনমানবহীন উপত্যকায় রাত কাটাতে হতো তখন তারা চিৎকার করে বলতো ঃ "আমরা এ উপত্যকার রবের (অর্থাৎ এ উপত্যকার ওপর কর্তৃত্বশালী জিন বা এ উপত্যকার মালিক) আশ্রয় চাচ্ছি।" অন্যদিকে, ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসার (আ) পেশকৃত মহান নিশানীগুলো দেখে (فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ) "নিজের শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করে সে সদর্পে নিজের ঘাড় ঘুরিয়ে থাকলো।" (আয যারিয়াত, ৩৯)। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ তারা বস্তগত, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই হযরত মারয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এলেন (তিনি তাঁকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ

"যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" (মারয়াম, ১৮) হযরত নূহ (আ) যখন আল্লাহর কাছে অবাস্তব দোয়া করলেন এবং জবাবে আল্লাহ তাঁকে শাসালেন তখন তিনি সংগে সংগেই আবেদন জানালেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ

"হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।" (হুদ, ৪৭) হযরত মূসা (আ) যখন বনি ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"আমি মূর্খ–অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।"

(আল বাকারাহ, ৬৭)

হাদীস গ্রন্থগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো এ একই পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত দোয়াগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ (مسلم)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দোয়াগুলোতে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই।" (মুসলিম)

عن ابن عمر رض كان من دعاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاْةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (مسلم)

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া ছিল ঃ হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عن زيد بن ارقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللّٰهُمَّ

اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَّتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ (مسلم)

"যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দোয়া কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عَنْ ابى هريرة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (ابو داود)

'হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ, মানুষ যেসব জিনিসের সাথে রাত অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে ক্ষুধা সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর আত্মসাৎ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ এটা বড়ই কলুষিত হৃদয়ের পরিচায়ক।" (আবু দাউদ)।

عَنْ انس ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ (ابو داود)

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ)

عن عائشة ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكمات اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ –

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো সহ দোয়া চাইতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আগুনের ফিত্না এবং ধনী ও দরিদ্র হওয়ার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن قطبة بن مالك كان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الاَخْلَاقِ وَالاَعْمَالِ وَالاَهْوَاءِ (ترمزى)

"কুতবাহ ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অসৎ চরিত্র, অসৎ কাজ ও অসৎ ইচ্ছা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

শাকাল ইবনে হুমাইদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমাকে কোন দোয়া বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার বাকশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার যৌন ক্ষমতার অনিষ্ট থেকে।" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عَنْ انس بن مالك كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (وفى رواية لمسلم) وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (بخارى ومسلم)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, কুড়েমি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) আর ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকেরা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ خَوْلَةَ بنت حُكَيم السُّلَمِيَّةِ سمعتُ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عَلَيْهِ وسلم يقول مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّه شَئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ (مسلم)

"খাওলা বিনতে হুকাইম সুলামীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন নতুন মনযিলে নেমে একথাগুলো বলবে—আমি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর নিষ্কলংক কালেমাসমূহের আশ্রয় চাই, সেই মনযিল থেকে রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।" (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন হাদীস থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম। এ থেকে জানা যাবে, প্রতিটি বিপদ–আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবেলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয়

চাওয়াই মু'মিনের কাজ। অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

৩. মূলে رَبِّ الْفَلَقِ (রব্বিল ফালাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ফালাক" শব্দের আসল মানে হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ এ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন, রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতার উদয় হওয়া। কারণ, আরবীতে "ফালাকুস সুবহ" (فَلَقَ الصبح) শব্দ "প্রভাতের উদয়" অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও মহান আল্লাহর জন্য فَالِقُ الْاِصْبَاحِ (ফালেকুল ইসবাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে, "যিনি রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের উদয় করেন।" (আল আন'আম, ৯৬) "ফালাক" শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সৃষ্টি করা। কারণ দুনিয়ায় যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, সবগুলোই কোন না কোন জিনিস ভেদ করে বের হয়। বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়। সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়। সমস্ত ঝরণা ও নদী পাহাড় বা মাটি চিরে বের হয়। দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে। বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। মোটকথা, অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি জিনিস কোন না কোনভাবে আবরণ ভেদ করার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ মণ্ডলও প্রথমে একটি স্তূপ ছিল, তারপর তাকে বিদীর্ণ করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا এ আকাশ ও পৃথিবী সবকিছুই স্তূপীকৃত ছিল, পরে আমি এদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। (আল আম্বিয়া, ৩০) কাজেই এ অর্থের প্রেক্ষিতে ফালাক শব্দটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাচ্ছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। এখানে আল্লাহর মূল সত্তাবাচক নাম ব্যবহার না করে তাঁর গুণবাচক নাম "রব" ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, আশ্রয় চাওয়ার সাথে আল্লাহর "রব" অর্থাৎ মালিক, প্রতিপালক, প্রভু ও পরওয়ারদিগার হবার গুণাবলীই বেশী সম্পর্ক রাখে। তাছাড়া "রব্বুল ফালাক" এর অর্থ যদি প্রভাতের রব ধরা হয় তাহলে তাঁর আশ্রয় চাওয়ার মানে হবে, যে রব অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে প্রভাতের আলো বের করে আনেন আমি তাঁর আশ্রয় নিচ্ছি। এর ফলে তিনি বিপদের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যদি এর অর্থ সৃষ্টিজগতের রব ধরা হয়, তাহলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টির মালিকের আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি নিজের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।

৪. অন্য কথায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এ বাক্যে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি

করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যদি শুধু একটি মাত্র বাক্য বলেই বক্তব্য শেষ করে দেয়া হতো এবং পরবর্তী বাক্যগুলোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা নাই–বা বলা হতো তাহলেও এ বাক্যটি বক্তব্য বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এখানে সমস্ত সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নেয়া হয়েছে। এই ব্যাপকভাবে আশ্রয় চাওয়ার পর আবার কতিপয় বিশেষ অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, আমি স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি, তবে বিশেষভাবে সূরা আল ফালাকের অবশিষ্ট আয়াতসমূহে ও সূরা আন নাসে যেসব অনিষ্টকারিতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এমন পর্যায়ের যা থেকে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের বড় বেশী মুখাপেক্ষী।

তৃতীয়ত, সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ লাভ করার জন্য সবচেয়ে সংগত ও প্রভাবশালী আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপার যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হচ্ছে তাদের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ, তিনি সব অবস্থায় নিজের সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। তিনি তাদের এমন সব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানেন যেগুলো আমরা জানি, আবার আমরা জানিনা এমনসব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর আশ্রয় হবে, যেন এমন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে আমরা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা–অজানা অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাছাড়া কেবল দুনিয়ারই নয়, আখেরাতের সকল অনিষ্টকারিতা থেকেও পানাহ চাওয়াও এর অন্তরভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত, অনিষ্টকারিতা শব্দটি ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারণে ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় সে জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন রোগ, অনাহার, কোন যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ–বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা দংশিত হওয়া, সন্তানের মৃত্যু শোকে কাতর হওয়া এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য অনিষ্টকারিতা প্রথমোক্ত অর্থের অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলো যথার্থই কষ্ট ও যন্ত্রণা। অন্যদিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুফরী, শির্ক এবং যেসব ধরনের গোনাহ ও জুলুম দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলোর পরিণাম কষ্ট ও যন্ত্রণা। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এগুলো সাময়িকভাবে কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় না বরং কোন কোন গোনাহ বেশ আরামের। সেসব গানাহ করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং লাভের অংকটাও হাতিয়ে নেয়া যায়। কাজেই এ দু'অর্থেই অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়।

পঞ্চমত, অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি অর্থও রয়েছে। যে অনিষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তাকে খতম করে দাও। আর যে অনিষ্ট এখনো হয়নি, তার সম্পর্কে বান্দা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! এ অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

৫. সৃষ্টিজগতের অনিষ্টকারিতা থেকে সাধারণভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার পর এবার কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষভাবে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মূল আয়াতে غَسِقٍ اِذَا وَقَبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গাসেক' (غاسق) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ "নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত।" (বনি ইসরাঈল, ৭৮)

আর 'ওয়া কাবা' (وَقَبَ) মানে হচ্ছে, প্রবেশ করা বা ছেয়ে যাওয়া। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ অপরাধ ও জুলুম রাতের অন্ধকারেই সংঘটিত হয়। হিংস্র জীবেরাও রাতের আঁধারেই বের হয়। আর এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় আরবে রাজনৈতিক অরাজকতা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তাতে রাতের চিত্র তো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে লুটেরা ও আক্রমণকারীরা বের হতো। তারা জনবসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো লুটতরাজ ও খুনাখুনি করার জন্য যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের চেষ্টা করছিল, তারাও রাতের আঁধারেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কারণ, এভাবে হত্যাকারীকে চেনা যাবে না। ফলে তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ–আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে আঁধার রাতের অনিষ্টকারিতা থেকে প্রভাতের রবের আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম সম্পর্ক রয়েছে তা কোন গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকার কথা নয়।

এ আয়াতের ব্যাখার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও : هٰذَا الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইযা ওয়াকাব (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া)। এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ইযা ওয়াকাব (اِذَا وَقَبَ) মানে হচ্ছে এখানে اِذَا خَسَقَ (ইযা খাসাকা) অর্থাৎ যখন তার গ্রহণ হয়ে যায় অথবা চন্দ্রগ্রহণ তাকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদের দিকে এভাবে ইশারা করেছিলেন তখন চন্দ্রগ্রহণ চলছিল। আরবী আভিধানিক অর্থেও اِذَا وَقَبَ কখনো اِذَا خَسَفَ হয় না। তাই আমার মতে এ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে : চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রসূলুল্লাহ (সা) উক্তির অর্থ হচ্ছে—এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, চাঁদের আলো আত্মরক্ষাকারীর জন্য ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় আক্রমণকারীর জন্য আর তা অপরাধীকে যতটুকু সহায়তা করে, যে অপরাধের শিকার হয় তাকে ততটুকু সহায়তা করে না। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ انتشرت الشياطين فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمه العشاء -

"যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো, যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।"

৬. মূলে نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। 'উকাদ' (عُقَد) শব্দটি "উকদাতুন" (عقدة) শব্দের বহুবচন। এর মানে হচ্ছে গিরা। যেমন সূতা বা রশিতে যে গিরা দেয়া হয়। নাফস (نفث) মানে ফুঁক দেয়া। নাফফাসাত (نفثت) হচ্ছে নাফফাসাহ (نفاثه)-এর বহুবচন। এ শব্দটিকে علامه এর ওজনে ধরা হলে এর অর্থ হবে খুব বেশী ফুঁকদানকারী। আর স্ত্রীলিংগে এর অর্থ করলে দাঁড়ায় খুব বেশী ফুঁকদানকারিনীরা অথবা ফুঁকদানকারী ব্যক্তিবর্গ বা দলেরা। কারণ আরবীতে "নফস" (ব্যক্তি) ও "জামায়াত" (দল) স্ত্রীলিংগ অধিকাংশ তথা সকল মুফাস্সিরের মতে গিরায় ফুঁক দেয়া শব্দটি যাদুর জন্য রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, যাদুকর সাধারণত কোন সূতায় বা ডোরে গিরা দিতে এবং তাতে ফুঁক দিতে থাকে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি পুরুষ যাদুকর বা মহিলা যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রভাতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন যাদু করা হয়েছিল, তখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসটি থেকেও ওপরের অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরা দু'টির এ একটি বাক্যই সরাসরি যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আবু মুসলিম ইসফাহানী ও যামাখশারী 'নাফফাসাত ফিল উকাদ' বাক্যাংশের অন্য একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, এর মানে হচ্ছে ঃ মেয়েদের প্রতারণা এবং পুরুষদের সংকল্প, মতামত ও চিন্তা–ভাবনার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার। একে তারা তুলনা করেছেন যাদুকরের যাদুকর্মের সাথে। কারণ, মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে পুরুষদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেন মনে হয় কোন যাদুকর তাদেরকে যাদু করেছে। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত রসাত্মক হলেও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাদাতাগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, এটি সেই স্বীকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। আর ইতিপূর্বে আমরা ভূমিকায় এ দু'টি সূরা নাযিলের যে সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসেছি তার সাথে এর মিল নেই।

যাদুর ব্যাপারে অবশ্যি একথা জেনে নিতে হবে, এর মধ্যে অন্য লোকের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার জন্য শয়তান, প্রেতাত্মা বা নক্ষত্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। এ জন্য কুরআনে একে কুফরী বলা হয়েছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

"সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।" (আল বাকারা, ১০২) কিন্তু তার মধ্যে কোন কুফরী কালেমা বা শিরকী কাজ না থাকলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন সাতটি কবীরা গোনাহের অন্তরভুক্ত করেছেন, যা মানুষের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। এ

প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকর জিনিস থেকে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণ নাশ হারাম করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া সেই প্রাণ নাশ করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করা, জিহাদে দুশমনের মোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সতীসাধ্বী মু'মিন মেয়েদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের দোষারোপ করা।

৭. হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক এ আশা করতে থাকে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে, অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এখানে হিংসুক যখন হিংসা করে অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ, যতক্ষণ সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ততক্ষণ তার জ্বালা-পোড়া তার নিজের জন্য খারাপ হলেও যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার জন্য এমন কোন অনিষ্টকারিতায় পরিণত হচ্ছে না, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন কোন হিংসুক থেকে এমন ধরনের অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে তখন তার হাত থেকে বাঁচার প্রধানতম কৌশল হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এই সাথে হিংসুকের অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসও সহায়ক হয়। এক, মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহ না চাইলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। দুই, হিংসুকের কথা শুনে সবর করবে। বেসবর হয়ে এমন কোন কথা বলবে না বা কাজ করতে থাকবে না, যার ফলে সে নিজেও নৈতিকভাবে হিংসুকের সাথে একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তিন, হিংসুক আল্লাহভীতি বিসর্জন দিয়ে বা চরম নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যতই অন্যায়-অশালীন আচরণ করতে থাকুক না কেন, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে যেন সবসময় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। চার, তার চিন্তা যেন কোন প্রকারে মনে ঠাঁই না দেয় এবং তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন সে নেই। কারণ, তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাওয়াই হিংসুকের হাতে পরাজয় বরণের পূর্ব লক্ষণ। পাঁচ, হিংসুকের সাথে অসদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কখনো যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে যে হিংসাকারীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যি তা করা উচিত। হিংসুকের মনে যে জ্বালাপোড়া চলছে, প্রতিপক্ষের এ সদ্ব্যবহারে তা কতটুকু প্রশমিত হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই! ছয়, যে ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে তাওহীদের আকীদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তার ওপর অবিচল থাকবে। কারণ, যে হৃদয়ে তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আল্লাহর ভয়ের সাথে অপর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে,[১] এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,[২] যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।[৩]

১. এখানেও সূরা আল ফালাকের মতো 'আউযু বিল্লাহ' বলে সরাসরি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে আল্লাহর তিনটি গুণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ তিনটি গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর রাব্বুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর মালিকুন নাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষের বাদশাহ, শাসক ও পরিচালক হওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে, তাঁর ইলাহুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মাবুদ হওয়া। (এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইলাহ শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, এমন বস্তু বা ব্যক্তি যার ইবাদাত গ্রহণ করার কোন অধিকারই নেই কিন্তু কার্যত তার ইবাদাত করা হচ্ছে। দুই, যার ইবাদাত গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং যিনি প্রকৃত মাবুদ, লোকেরা তার ইবাদাত করুক বা না করুক। (আল্লাহর জন্য যেখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

এ তিনটি গুণের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মানে হচ্ছে : আমি এমন এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যিনি সমস্ত মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ হবার কারণে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন, যিনি নিজের বান্দাদের হেফাজত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যথার্থই এমন অনিষ্টের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, যার হাত থেকে নিজে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচাবার জন্য আমি তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি। শুধু এতটুকুই নয় বরং যেহেতু তিনিই রব, বাদশাহ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আমি পানাহ চাইতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে যিনি পানাহ দেবার ক্ষমতা রাখেন।

২. মূলে ٱلْخَنَّاسِ ٱلْوَسْوَاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وَسْوَاس এর মানে হচ্ছে, বারবার প্ররোচনা দানকারী। আর "ওয়াসওয়াসাহ" মানে হচ্ছে, একের পর এক এমন পদ্ধতিতে মানুষের মনে কোন খারাপ কথা বসিয়ে দেয়া যে, যার মনে ঐ কথা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাহ সৃষ্টিকারী যে তার মনে ঐ কথা বসিয়ে দিচ্ছে তা সে অনুভবই করতে পারে না। ওয়াসওয়াসাহ শব্দের মধ্যেই বারবার হবার অর্থ রয়েছে, যেমন 'যালযালাহ' (ভূমিকম্প) শব্দটির মধ্যে রয়েছে, বারবার ভূকম্পনের ভাব। যেহেতু মানুষকে শুধুমাত্র একবার প্রতারণা করলেই সে প্রতারিত হয় না বরং তাকে প্রতারিত করার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'ওয়াসওয়াসাহ'(প্ররোচনা) এবং প্রচেষ্টাকারীকে 'ওয়াসওয়াস' (প্ররোচক) বলা হয়। এখানে আর একটি শব্দ এসেছে খান্নাস। خناس এর মূল হচ্ছে খুনূস। خنوس এর মানে প্রকাশিত হবার পর আবার গোপন হওয়া অথবা সামনে আসার পর আবার পিছিয়ে যাওয়া। আর "খান্নাস" যেহেতু বেশী ও অত্যধিক বৃদ্ধির অর্থবোধক শব্দ, তাই এর অর্থ হয়, এ কাজটি বেশী বেশী বা অত্যধিক সম্পন্নকারী। একথা সুস্পষ্ট, প্ররোচনাদানকারীকে প্ররোচনা দেবার জন্য বারবার মানুষের কাছে আসতে হয়। আবার এই সঙ্গে যখন তাকে খান্নাসও বলা হয়েছে তখন এ দু'টি শব্দ পরস্পর মিলিত হয়ে আপনা আপনি এ অর্থ সৃষ্টি করেছে যে, প্ররোচনা দান করতে করতে সে পিছনে সরে যায় এবং তারপর প্ররোচনা দেবার জন্য আবার বারবার ফিরে আসে। অন্য কথায় একবার তার প্ররোচনা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সে ফিরে যায়। তারপর সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য বারবার সে ফিরে আসে।

"বারবার ফিরে আসা প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট"—এর অর্থ বুঝে নেয়ার পর এখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ কি, একথা চিন্তা করতে হবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিজেই তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এ অনিষ্ট তার মনে যেন কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিই লোকদের মনে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে সত্যের আহবায়ক আল্লাহর আশ্রয় চায়। সত্যের আহবায়কের ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে যেসব লোকের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার নিজের পক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে খুঁটে খুঁটে তাদের প্রত্যেকের বিভ্রান্তি দূর করে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার যে কাজ সে করে যাচ্ছে তা বাদ দিয়ে প্ররোচনাকারীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার এবং তাদের অভিযোগের জবাব দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে তার নিজের পক্ষেও সে পর্যায়ে নেমে আসা তার মর্যাদার পরিপন্থি। তাই মহান আল্লাহ সত্যের আহবায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তারপর নিশ্চিন্তে নিজেদের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করো। এরপর এদের মোকাবেলা করা তোমাদের কাজ নয়, রব্বুন নাস, মালিকুন নাস ও ইলাহুন নাস সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাজ।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, ওয়াসওয়াসাহ বা প্ররোচনা হচ্ছে অনিষ্ট কর্মের সূচনা বিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসৎকাজ করার আকাংখা সৃষ্টি হয় তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাংখা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব

বাড়তে থাকলে আরো সামনের দিকে গিয়ে অসৎ ইচ্ছা অসৎ সংকল্পে পরিণত হয়। আর তারপর এর শেষ পদক্ষেপ হয় অসৎকর্ম। তাই প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আল্লাহ যেন সেই স্থানেই তাকে নির্মূল করে দেন।

প্ররোচনা দানকারীদের অনিষ্টকারিতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শিরক, নাস্তিকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহপন্থীদের সাথে শত্রুতার উস্কানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবলম্বনের প্ররোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গোনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, ছোট ছোট সামান্য দু'চারটে গানাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ ছোট গানাহ–ই যদি বিপুল পরিমাণে করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গোনাহে মানুষ ডুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে শেষমেশ তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয় তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি দিতে ও উত্তেজিত করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ ও অভিযোগ–দোষারোপের ধারা বর্ষণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তার দুর্নাম রটাবার ও তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতে তাকে। তারপর শয়তান সে সেই মর্দে মু'মিনকে ক্রোধান্বিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে, এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেয়া তো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার এবং সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়ক এ ময়দান থেকেও যদি বিজয়ীর বেশে বের হয়ে আসে তাহলে শয়তান তার সামনে নিরুপায় হয়ে যায়। এ জিনিসটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমরা কোন উস্কানী অনুভব করো তাহলে আল্লাহর পানাহ চাও।" (হা–মীম সাজদাহ, ৩৬)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ –

"বলো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানী থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি।" (আল মু'মিনূন, ৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, কখনো শয়তানের প্রভাবে কোন অসৎ চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে যায় এবং

তারপর (সঠিক পথ) তাদের দৃষ্টি সমক্ষে পরিষ্কার ভেসে উঠতে থাকে।"

(আল আরাফ, ২০১)।

আর এ জন্যই যারা শয়তানের এই শেষ অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ করে দিয়ে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

"অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এ জিনিস লাভ করতে পারে না।"

(হা–মীম আস সাজদাহ, ৩৫)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সামনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই বাইর থেকে প্ররোচনা দেয় না বরং ভেতর থেকে মানুষের নিজের নফসও প্ররোচনা দেয়। তার নিজের ভ্রান্ত মতবাদ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ স্বার্থ–লালসা তার ইচ্ছা, সংকল্প, বিশ্লেষণ ও মীমাংসা করার ক্ষমতাকে অসৎপথে চালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শুধু নয়, মানুষের ভেতরের তার নিজের নফসের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। একথাটিকেই কুরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ "আর আমি তাদের নফস থেকে উদ্ভুত প্ররোচনাসমূহ জানি।" (কাফ, ১৬) এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বহুল প্রচারিত ভাষণে বলেন ঃ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا "আমরা নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।"

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, প্ররোচণা দানকারীরা দুই ধরনের লোকদের মনে প্ররোচনা দান করে। এক, জিন এবং দুই, মানুষ। এ বক্তব্যটি মেনে নিলে এখানে নাস نَاس বলতে জিন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাঁরা বলেন, এমনটি হতে পারে। কারণ, কুরআনে যখন رِجَالٌ (পুরুষরা) শব্দটি জিনদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিনের ৬ আয়াতে দেখা যায় এবং যখন نَفَرٌ (দল) শব্দটির ব্যবহার জিনদের দলের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন সূরা আহকাফের ২৯ আয়াতে দেখা যায়, তখন পরোক্ষভাবে 'নাস' শব্দের মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল হতে পারে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ نَاس – انس ও اِنْسَانٌ শব্দগুলো আভিধানিক দিকে দিয়েই جِنّ (জিন) শব্দের বিপরীতধর্মী। জিন–এর আসল মানে হচ্ছে গোপন সৃষ্টি। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাকে জিন বলা হয়। বিপরীত পক্ষে 'নাস' ও 'ইনস' শব্দগুলো মানুষ অর্থে এ জন্য বলা হয় যে, তারা প্রকাশিত, তাদের চোখে দেখা যায় এবং ত্বক দিয়ে, অনুভব করা যায়। সূরা কাসাসের ২৯ আয়াতে اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا বলা হয়েছে। এখানে اٰنَسَ (আ–নাসা) মানে رَاٰى (রাআ) অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) "তূর পাহাড়ের কিনারে আগুন দেখেন।" সূরা আন নিসার ৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا "যদি তোমরা অনুভব করো, এতিম শিশুদের এখন বুঝসুঝ হয়েছে।

اٰنَسْتُمْ (আ–নাসতুম) মানে اَحْسَسْتُمْ (আহসাসতুম) বা رَاَيْتُمْ (রাআইতুম)। কাজেই আরবী ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'নাস' শব্দটির মানে জিন হতে পারে না।

তাই এখানে আয়াতটির সঠিক মানে হচ্ছে, "এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে।" অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, প্ররোচনা দান করার কাজ জিন শয়তানরাও করে আবার মানুষ শয়তানরাও করে। কাজেই এ সূরায় উভয়ের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এবং হাদীস থেকেও। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِى بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا –

"আর এভাবে আমি জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তারা পরস্পরের কাছে মনোমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।" (আল আন আম, ১১২)

আর হাদীসে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি নামায পড়েছো? আমি জবাব দিলাম, না। বললেন, ওঠো এবং নামায পড়ো। কাজেই আমি নামায পড়লাম এবং তারপর আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন ঃ

يَا اَبَاذَرٍّ نَعَوَّذْ بِا اللّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ –

"হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়? বললেন, হাঁ।

শেষ কথা

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম মাসে (ঈসায়ী ১৯৪২ ফেব্রুয়ারি) তাফহীমুল কুরআন লেখার যে সুকঠিন দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলাম, তিরিশ বছর চার মাস পরে আজ তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি—এ জন্য গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি নিজের এক নগণ্য বান্দাকে তাঁর পবিত্র কিতাবের খেদমত করার তাওফীক দান করেছেন। তাঁর প্রত্যেক্ষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থে আমি যা কিছু সঠিক ও সত্য আলোচনা করেছি তা মূলত মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। আর যেখানেই কুরআনের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে আমি কোন ভুল করেছি, তা অবশ্যি আমার নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে কোন ভুল করিনি। তাই আল্লাহর অনুগ্রহের দরবারে এতটুকু আশা রাখি, তিনি এটি মাফ করে দেবেন এবং আমার এ কাজের মাধ্যমে তাঁর বান্দারা হিদায়াত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন সহায়তা লাভ করে থাকলে তাকে আমার মাগফেরাতের মাধ্যমে পরিণত করবেন। আলেম সমাজের কাছেও আমার আবেদন, আমার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তাঁরা যেন আমাকে অবহিত করেন। যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যে কথাটির ভ্রান্তি আমার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ আমি তা শুধরে নেবো। কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে জেনে-বুঝে কোন ভুল করার এবং কোন ভুল প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

এ কিতাবে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমি নিজে কুরআনকে যেভাবে বুঝেছি, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে সেভাবে কুরআন বুঝাবার জন্য এখানে চেষ্টা করেছি। কুরআনের আসল তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য এমন দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি যার ফলে পাঠক কুরআনের অন্তস্থলে পৌছুতে সক্ষম হন। কুরআন ও তার নিছক অনুবাদগুলো পড়ে মানুষের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় জাগে সেগুলো দূর করা এবং যেসব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা আমি করেছি। কুরআন মজীদে যেসব কথা ইশারা-ইঙ্গিতে, চুম্বক বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা আমি চালিয়েছি।

শুরুতে বেশী লম্বা-চওড়া আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তাই প্রথম জিলদের টীকাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারেই এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি যতই সামনে এগিয়ে যেতে থেকেছি ততই টীকায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এমনকি পরবর্তী জিলদগুলো দেখে এখন প্রথমেরগুলোকে সবাই অসম্পূর্ণ মনে করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে আমরা একটা ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা এক জায়গায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, পরবর্তী সূরাগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি হবার কারণে সেখানে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি যারা কুরআন মজীদকে তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার পড়েই ক্ষান্ত হন না, তারা সমগ্র কিতাব দ্বিতীয়বার পড়ার সময় নিজেরাই অনুভব করবেন যে পরবর্তী সূরাগুলোর ব্যাখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী সূরাগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হয়।

আবুল আ'লা
লাহোর,
২৪ রবিউস সানী, ১৩৯২ হিজরী
(৭ জুন, ১৯৭২ ইং)